International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-II, September 2016, Page No. 42-51
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে গান্ধিজি

মদন মণ্ডল
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্কিম সরদার কলেজ, ট্যাংরাখালি, দঃ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Mohandas Karamchand Gandhi was an eminent political leader of Indian history. He was also a great philosopher. There was always firmness, strong believe, humanity, logic, truth and high idealism in his every statement and work. Through his life style we can learn the proper ways of life; he never imposed anything on anyone. This article attempts to accumulate his concept on the life style of an individual and the ideal standard of living. Very often, many of his statements, ideas and concepts are misinterpreted and controversy arises. His concept of individual life has also been misinterpreted often and it lit flames of controversy. So, the present work intends to explain his concept on individual life, with the support of various statements given by him and given on him.

Key Words: Gandhi, Mohandas Karamchand, Standard of living, Personality development, Individualism, Socialism, Idealism, Materialism, Marxism, Gandhism.

পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যক্তি আসেন যাদের জীবন বাণীর চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি তাদের মধ্যে অন্যতম। তাই জওহরলাল যথার্থই বলেছেন যে, "He is far greater than what he writes"। গান্ধি সম্পর্কে এটাই হল পরম সত্য। গান্ধি কী লিখে গেছেন, কী বলে গেছেন, তাঁর সেই সব মতামত সম্পর্কে অনেক আপত্তি অনেক দিক থেকে উঠবে। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যার প্রভাব অতি বড় সমালোচক ও নিন্দুককেও চুপ করিয়ে দিত। আজ তিনি নেই, তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির যে প্রভাব তাও নেই। যাঁরা সেই প্রভাব ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছেন তাঁরাও একদিন থাকবেন না -তখন এ সম্বন্ধে যা লেখা, তা পড়া ছাড়া আর বেশী কিছু বোঝা যাবে না।

আমরা এখানে তত্ত্ব হিসাবে ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে গান্ধিজির ধারণা নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি জীবনটাকেই শ্রেষ্ঠ বাণী হিসাবে বলতে চেয়েছেন। তিনি জীবন প্রণালীর উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি কথার সাথে কাজের সম্পর্ক রক্ষার কথা বলেছেন। শুধু এটুকুই নয় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন নিজের ব্যক্তি-জীবনটা মানুষ কীভাবে দেখলো, গড়লো তারই সাধনায় যে ছবি সেটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ বাণী। এই বাণীকে সমগ্র জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত করে তোলাই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে গান্ধিজি একান্ত সাধনার দ্বারা নিজেকে কী সুন্দরই না করেছিলেন, aesthetic sense এর তিনি নতুন মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে মানুষ কী শান্তি, কী সহজ-সরল, কী সুন্দর ব্যবহারই পেতো! এতবড় নেতার বোঝা জাতি বা কংগ্রেস বা কেউ এতটুকু অনুভব করতো না। তিনি আলগোছে জাতির পাশে

এসে জাতিকে কখন থেকে সাহায্য করে আসছেন যেন, তা কেউ টের পায়নি। একথা বলা যায় যে চীনদেশের দার্শনিক কবি Lao Tse –এর কল্পনা তিনি সার্থক করেছিলেন -

Therefore in order to be the chief
among the people
One must speak like the inferiors,
In order to be foremost among the people,
One must walk behind them.

Thus it is that the saga stay alone
And the people do not feel his might;
Walks infront,
And the people do not wish him harm.

Then the people of the world are glad
to uphold him for ever.
Because he does not contend.
No one in the world can contend against him.

অবশ্য এমন ঋষি তিনি ছিলেন না, যাঁর শত্রুর অভাব ছিল। তিনি যে মানুষের মুক্তিদাতা। তাঁকে যে শহিদ হতেই হত।

এই ব্যক্তিগত চরিত্র জাতির উপরে, সহসা কী মহান সাড়া, কী মহান মুক্তি-কামনা এনে দিয়েছিল তার ছোট একটা চিত্র আমরা নেহেরুর লেখা থেকে তুলে দিই। তাছাড়া মহাত্মার আহ্বান যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি তাঁর দাবির ঢংটাও কত অদ্ভুত। তাঁর অজ্ঞাতে কী গভীর শক্তি, অথচ নেই এতটুকু insolence; তাঁর বাণীতে কত আলো, অথচ নেই এতটুকু জ্বালা। নেহেরু লিখেছেন, ‘‘He was like a powerful current of fresh air that made us stretch ourselves and take deep breaths; like a beam of light that pierced the darkness and remove the scales from our eyes; like a whirlwind that upset many things, but most of all the working of people’s mind. He did not descend from the top; he seemed to emerge from millions of India, speaking their language and incessantly drawing attention to them and their appalling condition. Get off the backs of these peasants and workers, he told us, all of you who live by their exploitation; get rid of the system that produces misery. Political freedom took new shape then and acquired a new content…. The essence of his teaching was fearlessness and truth and action allied to these, always keeping the welfare of masses in view. The greatest gift for an individual or a nation, so we had been told in our ancient books, was abhaya (fearlessness), not merely bodily courage but the absence of fear from the mind. Janaka and Yajnavalka had said, at the dawn our history, that it was the function of the leaders of a people to make them fearless. But the dominant impulse in India under the British rule was that of fear-pervasive, oppressing, strangling fear; fear of the army, the police, the widespread secret service; fear of the official class, fear of the laws meant to suppress and of prison; fear of the landlord’s agents; fear of the moneylenders; fear of unemployment and starvation, which were always on the threshold. It was against this all pervading fear that Gandhiji’s quiet and determined voice was raised: be not afraid.” (Neheru, Jawaharlal, 1994, p. 299).

যাঁরা তাঁর বই প'ড়ে, লেখা প'ড়ে তাঁকে বুঝতে চেয়েছেন, তাঁদের তিনি বলেছেন-

> *"You must watch my life, how I live, eat, sit, talk, and behave in general. The sum-total of all those in me is my religion." (Tandulkar, D. J., 1953, Vol. 7, p. 264).*

অধ্যাপক নির্মল বসু বহুকাল থেকে গান্ধিবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা ও লেখালেখি করতে চাইলে গান্ধিজি বললেন যে, "না তা হবে না, তোমাকে আমার জীবনটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করতে হবে, তবেই তুমি আমার মতামত ও বাণী কী তা বুঝতে পারবে।"[4] তাই তাঁকে নিয়ে তিনি নোয়াখালিতে গেলেন; 'তাঁর সমস্ত জীবনযাত্রা থেকে তাঁকে বুঝতে হবে', কথা কয়টি থেকে নয়। সাধারণতঃ দেশনায়ক, ধর্মনায়কেরা ব্যক্তিগত জীবনটাকে আড়াল করে রাখেন জনতার দৃষ্টি থেকে, কিন্তু গান্ধিজির সে ভয় ছিল না। তিনি সর্বদাই একটা হাটের মধ্যে বাস করতেন; সবাই দেখুক, সবাই বুঝুক তাঁকে, -এই তাঁর ইচ্ছা। সবাই সমালোচনা করুক, ভালো বলুক, মন্দ বলুক -তাতে তাঁর কোন ভয় বা সংকোচ ছিল না। তিনি জানতেন মুখের কথার সাথে বাস্তব জীবনের যে পার্থক্য, তারই ছিদ্র দিয়ে নানা দুর্বলতা আসে কর্মীর জীবনে। তাই তিনি তাঁর জীবনটাকে একটা খোলা পুস্তক হিসাবে সবার কাছে ধরে রাখতেন। তারঁ মুখের কথা লোকে লিখুক -তা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তাঁর জীবন থেকে শিখুক, দেখুক জীবনটাকে কী করে এক ক্লান্তিহীন বিরামহীন সাধনায় ভরে তোলা যায় -এই ছিল তাঁর আদর্শ। জীবনে তাই তাঁর কোন গোপনীয়তার অবকাশ ছিল না। তাঁর যাবতীয় শিক্ষা, যাবতীয় মতবাদ, যাবতীয় বাণী প্রয়োগ করার প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র হল তাঁর নিজের জীবন। সেই জীবনের ফলন থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু। দেশশুদ্ধ লোককে তৈরি করার আগে নিজেকে তৈরি করা হল তাঁর ধর্ম। নিজের জীবনটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় প্রচারের একটি অদম্য নীরব শক্তি। "World Fellowship of all Faiths" তাঁর কাছে একবার একটি বাণী চেয়ে পাঠায়। গান্ধিজি উত্তরে শুধু এইটুকু লিখে পাঠান- "What message can I send through pen, if I am not sending any through the life I am living?" .....এখানেও সেই একই কথা যে তাঁর জীবনই তাঁর বাণী, এছাড়া তাঁর অন্য কোন বাণী নেই। বরং আমরা পরে দেখাব কীভাবে তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে সাবধান করে গেছেন যেন তাঁরা গান্ধিবাদী বলে কোন sect বা সম্প্রদায় না তৈরি করেন, তাঁর লেখা নিয়ে বিতণ্ডা না ওঠান। তিনি যা করেছেন এবং করতে চেষ্টা করেছেন, তারই মূল্যামূল্য বিচার চলবে হয়তো -তিনি এমন আশা করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর মতামত নিয়ে দল উপদল সৃষ্টি করতে তিনি বারণ করে গেছেন; -সেকথা পরে হবে।

কোন লোকের বিচার তিনি কথা দিয়ে করতেন না, করতেন সেই ব্যক্তির কাজ ও তার জীবন দিয়ে। ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর এই যে এত জোর, এ হল গান্ধির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে ব্যক্তি জীবন এত উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে যে, একজন ব্যক্তি -সে সমাজে ধনীই হোক, আর জমিদারই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না যদি সে সত্যি মানুষ হয়। যদি তা হয় তবে সে তার ধনটাকে নিজের ধন বলে কখনোই মনে করবে না, করবে ট্রাস্টি বা অছি হিসাবে মাত্র। তাঁর অছিবাদও এই ব্যক্তির আদর্শবাদ থেকে এসেছে। আমরা এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি। এইখানে কেবল এইটুকু খেয়াল করা দরকার যে ব্যক্তির জীবনের উপর এই যে এত জোর, এরই জন্য তিনি সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এসব কথার উপর জোর না দিয়ে ব্যক্তির আদর্শবোধ ও আদর্শজীবনের উপরে এত জোর দিয়েছিলেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তিনি সমাজব্যবস্থার উপর ততটা নজর ও গুরুত্ব দেননি, এর ফলে তাঁর মতবাদ দুর্বল থেকে গেছে। ব্যক্তিরা যদি সবাই আদর্শ মানুষ হয়, তবে সমাজব্যবস্থা যাই থাকুক, কিছু আসে যায় না -এমন ধরণের একটা অর্থ তাঁর কথাবার্তা থেকে অনেক সময় বোঝা যেত। এখানেই মার্কসবাদের সাথে তাঁর প্রধান বিরোধ। মার্কসবাদীরা বলবে, সমাজব্যবস্থা ভালো না হলে সমাজব্যবস্থাকে আগে ভালো করতে হবে। আর গান্ধিবাদীরা বলবে, আগে মানুষ ভালো না হলে আদর্শ সমাজব্যবস্থা তৈরি হতে পারে না। কাজেই আগে আমাদের মানুষ হতে হবে, মনুষ্যত্বের সাধনা করতে হবে। এখানে ঐতিহাসিক তর্ক এসে গেল, কারণ এই তর্ক অনেকদিনের

-আদর্শবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের তর্ক। কাজেই আমরা এই তর্কের মধ্যে যাওয়া দরকার বলে মনে করি না। কেন না এটা একটা প্রচলিত তর্ক, সবারই জানা।

ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর ও ব্যবহারের উপর গান্ধিজি যে এতো জোর দিয়েছেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। সমাজের পরিবর্তন ও সংশোধন কার্যে ব্যক্তিসমূহের চেষ্টার পিছনে যে চরিত্র বল দরকার, তার উপরই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনটা যাই হোক, তার কথাগুলি চটকদার হলেই হলো- এমন ধরণের হালকা হুজুগকে তিনি পছন্দ করতেন না। এবং যারাই কোন না কোন সত্যিকারের আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারাই জানেন কার্যক্ষেত্রে গান্ধিজির এই যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার ব্যবহারের শুদ্ধতা নিয়ে দাবি, তা কখনোই বাড়াবাড়ি নয়। বস্তুতঃ এ না হলে কোন সত্যিকার কাজ করাই সম্ভব হয় না।

কোন কোন সুবিধাবাদী লেখকরা এমন ধরণের যুক্তির অবতারণা করতে চেয়েছেন যে গান্ধিজি ছিলেন ব্যক্তিবাদী। গান্ধিজি ব্যক্তি-চরিত্রের উপর জোর দিয়েছেন, তার মানে কিন্তু তিনি কখনোই ব্যক্তিবাদ প্রচার করেননি, এবং নিজেও কখনো ব্যক্তিবাদী ছিলেন না। অনেক বুর্জোয়া চিন্তানায়ক আছেন যারা বলতে চান সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিত্ব খর্ব হবে, এইজন্যই সমাজতন্ত্র গ্রহণ করা যায় না। তাঁরা হলেন ব্যক্তিবাদী। তারা সমাজের চেয়ে ব্যক্তিকে বড় করে দেখেন। সমাজ হল ব্যক্তির জন্য- এমনি হল তাদের দাবী। কিন্তু গান্ধিজি প্রথমতঃ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন না, দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যে সমালোচনা তা ব্যক্তিবাদ থেকে মোটেই আসেনি। তাঁর আপত্তি আছে সমাজতন্ত্র আনয়নের পদ্ধতি নিয়ে, যেখানে সমাজতান্ত্রিকরা হিংস্র পন্থায় বিপ্লব আনতে চায় সেখানে, আর যেখানে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির পরিণাম হিসাবে কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা আছে সেখানে। এই কেন্দ্রীকরণ ব্যক্তিবাদী আমেরিকায় বা ইংল্যাণ্ডে চরম মূর্তি নেয় নি কি? কেন্দ্রীকরণের ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা সেখানে যৎসামান্যই আছে। সে যাই হোক, ব্যক্তিবাদের প্রেরণায় গান্ধিজি কেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করেননি। আসলে গান্ধিজি ব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করতেন না।

কেননা, তাঁর জীবনের স্বপ্নটা কী সেটা একবার স্মরণ করুন। নিজেকে শূন্য করে দেওয়া এটাই হল তাঁর সাধনা। নিজেকে শূন্য করতে পারলেই তাঁর সত্য বা ভগবান প্রকাশিত হতে পারেন, এই হল যাঁর ধারণা তাঁর পক্ষে কখনো ব্যক্তিবাদ প্রচার করা সম্ভব? ঠিক তার উল্টো; তিনি ব্যক্তির কোন স্থান দেননি, এই মন্তব্যই বরং করা চলে। ভগবান পাওয়া যাঁর জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য এবং নিজের ব্যক্তিগত মোহ সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না পারলে সে নির্মল সত্যের অথবা ভগবানের বিকাশ সম্ভব নয়, impersonal truth of objective reality -কে পাওয়া যাঁর কাছে বড় কথা; তাঁর কাছে ব্যক্তিবাদ, অথবা ব্যক্তির সম্পত্তি, ব্যক্তির মান, ব্যক্তির মোহ, ব্যক্তির ভোগ -এসব কোনো কিছুরই অর্থ হয় না। তিনি মীরা বেহেনকে দিনরাত এই সাধনা করতে বলেছেন যে, তুমি চেষ্টা কর তোমার আমিটা শূন্য করে দিতে, আমিটা আমাদের ধোকা মাত্র। তিনি মীরাকে নোয়াখালি থেকে লিখেছেন, "Do not even worry what I am faring, or what I am doing here. If I succeed in empting myself utterly, God will possess me. Then I know that everything will come true, but it is a serious question when I shall have reduced myself zero. Think of "I" and "O" in juxtaposition and you have the whole problem of life in two signs." (Gandhi, Mahatma, 1950, p. 224).

গীতার অপরিগ্রহবাদ থেকে, ধনসম্পত্তি থেকে মুক্তি হলো নিজেকে শূন্য করার একটা প্রাথমিক সোপান মাত্র। ধীরে ধীরে তাকে নিজের আমিত্বটাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। তখনই একমাত্র "সর্বধর্মানি পরিত্যজ্য মামেকং ব্রজ" -কথাটি আসে। নিরন্তর নিজেকে এই শূন্য করার সাধনা ভারতীয় ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। গান্ধিজি তা সর্বপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। অতএব ব্যক্তিবাদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই গান্ধিজিকে যারা individualism বা ব্যক্তিবাদের দলে টানতে চান, তারা অত্যন্ত ভুল করেন। এইভাবে গান্ধিজিকে বুর্জোয়া আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু সেটা অপচেষ্টা মাত্র।

বিকেন্দ্রীকরণ ও কুটিরশিল্পে গান্ধিজির যে বিশ্বাস ও আগ্রহ তার মূলেও ব্যক্তিবাদী প্রেরণা নেই। মানুষকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন রাখা দরকার, একথা গান্ধিজি বলেছেন বটে, কিন্তু তার তাৎপর্য ব্যক্তিবাদ থেকে নয়, বা কোন প্রকার স্বার্থপরতার কূপমণ্ডুকতার আবরণ তৈরি করার উদ্দেশ্য থেকে নয়। সেই নিজেকে শূন্য করার সাধনাতেও এই সমাজব্যবস্থাই সহায়ক হবে মনে করেই তিনি একথা বলেছেন। নিজেকে শূন্য করার অর্থ নিজেকে দাস করে ফেলা নয়, বা কোন সমাজব্যবস্থার অন্ধ যাঁতাকলে নিজের চেতনা, বিবেক ও বুদ্ধিকে খুইয়ে বসা নয়।

> *"Employing one's self", আর "to make one's self slave to all sorts of power and passion" -দুটো আলাদা মনোভাব। তিনি বলেছেন- "Let us not also forget that it is man's social nature which distinguish him from the brute. If it is his privilege to be independent, it is his duty to be interdependent. Only an arrogant man will claim to be independent of everybody else and be self-contained," (Tandulkar, D. J., 1953, Vol. 2, p. 476). তিনি বলেছেন, "Only a Robison Crusoe can afford to be self-sufficient. Individual liberty and interdependence are both essential for life in society." (Tandulkar, D. J., 1953, Vol. 7, p. 40).*

এছাড়া আমরা পূর্বেও দেখেছি যে তাঁর স্বদেশী ও সমাজ কথাটার মানে কি? তার অর্থ কূপমণ্ডুকতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা নয়। পৃথিবীর এমনিভাবে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকৃত বিভাগ তিনি চেয়েছেন বটে। কিন্তু তিনি পরিস্কার বলেছেন, ব্যক্তি সমাজের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে। একটি গ্রাম সমগ্র এলাকার প্রয়োজনে আত্মত্যাগের জন্য তৈরি থাকবে; একটি প্রদেশ সমগ্র দেশের জন্য, একটি দেশ সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত থাকবে। কাজেই এখানে ব্যক্তিবাদ বা ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা, এমনকি দেশকেন্দ্রীকতারও কোন ঠাঁই নেই। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যবহারেও তিনি সর্বদাই অন্যকে সাহায্য করার জন্য ব্যগ্র এবং অন্যের সাহায্য নিতে অকুণ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সেবার জন্য তাঁর আশেপাশে একগাদা লোক থাকায় তাঁর কোন আপত্তি ছিল না, কেন না তিনি আত্মকেন্দ্রীকতার শিক্ষা দিতেন না। সেবা করা ও সেবা গ্রহণ করা, এ দুটোই মানুষের সহজ স্বভাব হওয়া উচিত। Cardinal Newman-এর সেই অমর সঙ্গীতটি গান্ধিজি খুব পছন্দ করতেন, সেই Lead me, Kindly light etc. তাতে-

> *"I do not ask to see*
> *The distant scene: One step enough for me."*
> *(Newman, Cardinal, 1954)*

"একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট, দূরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাই না" -গান্ধিজির এই নীতিটির এখানে একটু আলোচনা করা দরকার। বেশীরভাগ কর্মীরা তাদের আদর্শটিকে একটি দূরের জিনিস বা লক্ষ্য মনে করে চলতে থাকে। তারা পথটার উপর কোন গুরুত্ব দেয় না, লক্ষ্যের উপরই তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। পথের সততা বা অসততা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি গান্ধিজির কাছে পথ ও লক্ষ্য ভিন্ন নয়, বরং পথ ও লক্ষ্য একই, ফলে লক্ষ্যটা সুন্দর হলেই হলো না; পথ বা উপায়টাও সুন্দর হওয়া চাই। এর যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, যখন অহিংসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন শুধু এতে জীবনদর্শনের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, সেইটুকুই উল্লেখ করব। কোনো এক দূর ভবিষ্যতে আমার জীবনস্বপ্ন কায়েম হবে- এইভাবে চললে মানুষ তার প্রতিদিনকার সংগ্রামটাকেও উপভোগ করতে পারে না। কেননা বর্তমানটা তার কাছে একটা আপদ বা evil necessity হিসাবে উপস্থিত হয়। যেমন করে হোক এই বর্তমানকে উত্তরে গিয়ে কবে আমি সেই মহান ভবিষ্যতে পৌঁছতে পারবো, সেই নেশায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ যদি একেবারে দূরের জিনিস হয়, যদি তা আমার জীবনে কায়েম হতে না চায়, তবে তো আমার গোটা জীবনটাই একটা সংগ্রাম ও নিরর্থক হানাহানি বলেই মনে হতে পারে। মানুষ কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্নেই লড়াই করতে পারেনা। মানুষের বর্তমান সংগ্রামটাকেও আকর্ষণীয় বা

উপভোগ্য বলে প্রতীয়মান করানো চাই। To enjoy the struggle, সংগ্রামটাকে যদি উপভোগ করতে না পারি, তবে ক্লান্তি আসতে পারে, সংগ্রামে বিরাগ জন্মাতে পারে, এমনকি সংগ্রাম বন্ধ রেখে কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতেই আদর্শবাদ আছে বলে আত্মপ্রতারণা জাগতে পারে। কিন্তু গান্ধিজির কাছে এ প্রশ্ন খুব সহজ। তিনি দূরের স্বপ্নে বিভোর নন, তিনি পথটাকে লক্ষ্য হিসাবে জেনেছেন বলে, প্রত্যেকটি দিন, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি ছোট বড় সংগ্রাম তাঁর কাছে পবিত্র। তিনি সংগ্রামটাকেই আদর্শের ক্ষেত্র বলে বুঝতে পেরেছেন, বর্তমানকেও ভবিষ্যতের মতো সম্মান দিতে, মূল্য দিতে পেরেছেন এবং বলতে পেরেছেন একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট, দূরের ভাবনায় আমি ভাবিত নই; যদি বর্তমানকে পালন করে যেতে পারি, তবেই ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালন করা হল। তাই বর্তমানটাকে হেলাফেলা করে ভবিষ্যতের জন্য বিভোর থাকা তিনি অনুচিত মনে করতেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাই তিনি আদর্শকে প্রত্যক্ষ করতেন। এবং এতেই তাঁর জীবন ভরে উঠত, প্রাণ খুশী থাকতো। কোথাও কোন দূর ভবিষ্যতে বা দূর রামরাজত্বে পৌঁছতে তাঁর কোন অহেতুক তাড়া নেই, কোন ত্রাস নেই। তিনি প্রশান্ত মনে বর্তমানকে গ্রহণ করেছেন, প্রত্যেক দিনের সংগ্রামকে মহান মূল্য দিয়েছেন এবং তার পালনেই সার্থকতা অনুভব করেছেন। তিনি সংগ্রামের মধ্যেই সংগ্রামের মূল্য পেয়েছেন, তাই তাঁর কোন অহেতুক ক্ষুধা নেই, এতে frustration-এর ক্ষেত্র কমে এলো। বস্তুতঃ গান্ধিজির কাছে দূরের রামরাজত্ব ততো লোভনীয় ছিল না। পৃথিবীতে কোনদিনই শোকদুঃখ থাকবে না -এমন কোন সমাজ ব্যবস্থায়ও তিনি বিশ্বাস করতেন না। বরং শোকদুঃখ, অন্যায় কিছু থাকবে বলেই মানুষ নিজেকে বড় করবার, মহান করবার একটা ক্ষেত্র পাবে; তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে -নইলে মানুষের সামনে বড় হবার কোন প্রেরণাই থাকবে না। হয়তো এমনি ধরণের একটা ধারণাও তাঁর ছিল। ব্যক্তির জীবনে এই সংগ্রাম, তার পক্ষে অভিশাপ নয়, বরং সুযোগ- এমনি ধরণের একটা বিশ্বাসও তাঁর যেন ছিল। তা না হলে তাঁর মঙ্গলময় ভগবানের এই অমঙ্গলময় বিশ্ববিধানের ব্যাখ্যা করা যায় না। যা হোক, One step is enough -এই নীতি তাঁকে জীবন সংগ্রামকে উপভোগ করার মতো শক্তি যোগাতো।

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্য তাঁর একটা নেশা ছিল বলা যায়। যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করেছে, সেখানেই তিনি ইতিহাসের সুন্দরতম সত্যকে উপলব্ধি করতেন। আত্মবলিদান বা martyrdom এর প্রতি তাঁর একটা অদম্য টান ছিল। রোমের ভাটিকানে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবির সামনে তিনি তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যীশু তাঁকে প্রবলভাবে টানতো -বিশেষ করে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। এই ছবিটা সম্বন্ধে গান্ধিজি নিজেই বলেছেন-

> *"What would not I have given to be able to bow my head before the living image at the Vatican of Christ Crucified ? It was with a wrench that I could tear myself away from the scene of living tragedy. I saw there at once that nations like individuals could only be made through the agony of the Cross and in no other way. Joy comes not out of infliction of pain on others but out of pain voluntarily borne by oneself." (Pravu, R. K, 1954, p. 6).*

ভাটিকানে ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের জীবন্ত প্রতিমূর্তির সামনে মাথা নত না করবার মত ক্ষমতাই বা আমার কোথায় ছিল? -একটা গভীর অন্তর্বেদনার জন্য ঐ জীবন্ত বিয়োগান্তক দৃশ্য থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারিনি। ওখানেই সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও অনুভব করলুম যে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বেদনার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি বড় হ'য়ে উঠতে পারে- অন্য কোনভাবে ব্যক্তির জীবন সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না। অপরকে ব্যাথা দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না, নিজ জীবনে সঞ্চারিত বেদনার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ নিহিত রয়েছে।

শহিদদের তিনি ঈর্ষা করতেন বলা যায়। তিনি যীশুকে ঈর্ষা করতেন, অমনি করে ক্রুশবহন করবেন, এই ছিল তাঁর অন্তরতম কামনা। এই কামনা তাঁর ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু মনের মধ্যে এই কামনা তাঁর কত যে তীব্র ছিল তা আমরা আরো একটি লেখা থেকে বুঝতে পারি। কানপুরের শহিদ গণেশ শংকর বিদ্যার্থী, যিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের

জন্য নিজ সম্প্রদায়ের হাতেই নিহত হন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকি উপলক্ষে একবার লিখেছেন, এবং সেই লেখার মধ্যে তাঁর সেই চিরন্তন কামনা ফুটে বেরোচ্ছেঃ

> *"I do not know if the sacrifice of Mr. Ganesh j Shankar Vidyarthi has gone in vain. His spirit always inspired me. I envy his sacrifice. Is it not shocking that this country has not produced another Ganesh Shankar? None after him came to fill the gap. Ganesh Shankar's Ahimsa was perfect Ahimsa. My Ahimsa will also be perfect if I could die similarly peacefully with axe blows on my head. I have always been dreaming of such a death, and I wish to treasure this dream. How noble that death will be,—a daggar attack on me from one side; an axe blow from another; a lathi wound administered from yet another direction and kicks and abuses from all sides and if in the midst of these I could rise to the occasion and remain non-violent and peaceful and could ask others to act and behave likewise, and finally I could die with cheer on my face and smile on my lips, then and then alone my Ahimsa will be perfect and true. I am hankering after such an opportunity and also wish Congressmen to remain in search of such an opportunity." (Pravu, R. K, 1954, p. 28).*

কী গভীর আকাঙ্ক্ষা! এই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা, এই শহিদের প্রেরণা তাঁর সমস্ত জীবনকে চিরকাল দোলা দিয়ে এসেছে। যে ভয়ংকর অথচ মহান মৃত্যুর কল্পনা তিনি নিজের জন্য প্রার্থনা করে গেছেন, সে মহান মৃত্যু তাঁর হয়েছে, যেন তিনি সহজেই জানতেন তাঁর ভবিষ্যত, এমনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। অর্থাৎ, নিজেকে বলি দেবার চেয়ে নিজের অপর কোন মহান পরিণাম তিনি ভাবতে পারতেন না। এই জন্যই তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ শহিদদের এত ঈর্ষা করতেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের এমন কদর্থ আবার যেন করা না হয় যে গান্ধিজি যেন শহিদ নাম নেবার জন্য লুব্ধ ছিলেন, এবং সুযোগ খুঁজে বেড়াতেন বা সুযোগ পাওয়া মাত্র তা গ্রহণ করে ইতিহাসে অমরতা লাভ করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন বা জীবনের সব ঝামেলা থেকে সহজে বিদায় নিয়ে বা পালিয়ে চলে যেতে চাইতেন। অন্যরা তাঁকে মারুক বা মেরে ফেলুক, এরূপ আশা পোষণ করার মধ্যে কল্পিত আততায়ীর উপর দোষারোপ করার হিংসা নিহিত আছে, কাজেই ওই জাতীয় প্রেরণাও গান্ধিজি সমর্থন করতেন না এবং তিনি দীর্ঘ একশত পঁচিশ বছর বাঁচবেন বলেই আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর জন্যও তৈরি ছিলেন। আরো একটা মজার কথা এই, তিনি যে কেবল বৃহৎ কাজের জন্যই নিজেকে বলি দেবার জন্য তৈরি থাকতেন, তা নয়। তাঁর কাছে প্রত্যেক কাজই সৎকাজ এবং মহৎ; এবং এজাতীয় যে কোন কাজের জন্য তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তথাকথিত মহান কাজের জন্যই তাঁর মহান প্রাণ বলির যোগ্যতা তিনি মনে করতেন না, কর্তব্য প্রত্যেকটিই মহান। এবং তা যত তুচ্ছ বলেই মনে হোক অপরের কাছে, তাঁর কাছে তা নয়। জগতের প্রত্যেকটি কাজ তাঁর জীবনকে দাবি করতে পারে -এমনি ধরণের একটি উদাহরণও আছে। একবার আপ্পাসাহেব পটবর্ধন রত্নগিরি জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন, তাঁকে কেন মেথরের (ভাঙ্গির) কাজ দেওয়া হবে না, এই দাবি নিয়ে। গান্ধিজি এই খবর অন্য কোনও একটি জেলে বসে পান। তিনি অমনি অনশন শুরু করে দিলেন, এবং অনশন তিনি কঠিন পণ করেই করেন। এত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তিনি কেন অনশন করতে গেলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধিজি বলেন, "Mine is a peculiar position, though I have hardened my heart, there are things about which I am exceedingly sensitive. To me, there is no difference of degree in matters of moment, as I am capable of giving life for great cause, I am equally capable of playing my life for a comrade. (Tandulkar, D. J., 1953, Vol. 3, p. 230)

মনে তাঁর এমন অহংকার ছিল না যে জগতের শ্রেষ্ঠ কাজের জন্যই তাঁর মতো জীবন বলিদান করা যায়। ঔচিত্য ও ন্যায্যতার কাছে তিনি সর্বদাই প্রাণ দান করতে প্রস্তুত। নিজেকে বলি দেবার এই প্রেরণাটা তাঁর জীবন-দৃষ্টিভঙ্গীর একটা অপরিহার্য অঙ্গ। একথাটা বাদ দিলে গান্ধিচরিত্র বোঝা সম্ভব নয়, তাঁর মতবাদ বোঝাও সম্ভব নয়, অহিংসা বোঝাও সম্ভব নয়।

গান্ধিজি যেখানে ব্যক্তিচরিত্রের উপর জোর দিয়েছেন সেখানে জোরটা ব্যক্তির উপর নয়, জোরটা চরিত্রের উপর। আর চরিত্র গঠনে তিনি নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। যারা শাসক বা শোষণকারী তাদের মূল্যবোধ বা ধর্মবোধকে যদি আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি অথবা লোভ করি তাহলে তাদের কোনকালেও হটানো যাবে না। সামন্ত্রতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ -এসব পরশ্রমজীবী অন্যায় প্রথা যেসব মূল্য দেয় সেইসব মূল্যের মানদণ্ডে যদি আমরা আমাদের চরিত্র গঠন করতে চাই, তাহলে আমরা তাদের প্রথাকে শক্তিশালী করবো মাত্র। যদি সেই লোভটাকে ঘৃণা করতে শিখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জন্য নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করি, তবেই শাসকশ্রেণি দুর্বল হয়ে যায়। আমরা তাদের অনুকরণ করতে গিয়েই তাদের শক্তিমান করে তুলি। আমাদের চোখকে ওরা ধাঁধাঁ করে দিতে পারে বলেই ওদের এতো ইজ্জত। তাই প্রচারের মাধ্যমে ওরা যাকে 'ভালো', যাকে 'চমৎকার', যাকে 'বৈজ্ঞানিক', যাকে 'সুন্দর' বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, গান্ধিজি তাকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। যেহেতু তিনি তাদের মানদণ্ডকে গ্রহণ করেননি, সহজ বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকটি জিনিস বিচার করে সেই সব জিনিসের নতুন মানদণ্ড বা Standard দিতে চেয়েছেন জনসাধারণের জন্য, সেহেতু আমাদের কাছে তা হঠাৎ কিরকম লাগে। "I have placed the simplest things before the people of India – simplest things calculated to bring about revolutionary changes e.g. khadi, prohibition, revival of handicrafts, basic education through crafts. But unless you can get over the intoxication of existing regime you will not see the simple things." (Gandhi, Mahatma, 28 Oct. 1939), *Harijan*. 7 (38), p. 319)

এই যে intoxication of regime..... এটা একটা সাঙ্ঘাতিক হুজুক। না বুঝে তালে তাল দেওয়ার একটা গড্ডালিকা মোহ আমাদের অনেকসময় পায়। শাসক শ্রেণিই এই Standard ও Intoxication সৃষ্টি করে, শাসিতেরা তাই অনুসরণ করতে ভালোবাসে, ফলে যাতে তার অমঙ্গল বা যাতে সত্যিকারের অপমান, তাকে নিয়েই নাচতে থাকে। এমন অবস্থায়ই শাসকশ্রেণি তাদের উপর জুলুম চালাতে সুবিধা পায়। মনের দাসত্ব তৈরি করতে না পারলে, গায়ের জোরে কোন প্রকার সামাজিক দাসত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। কাকে বিজ্ঞান বলা হচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই, কাকে আধুনিকতম আবিষ্কার বলে নাচা হচ্ছে তার বিচার নেই, একটু জবরজঙ্গ হলেই তা হবে বিজ্ঞান। জটিল হলেই বুঝতে হবে জ্ঞান, আর ঝাঁঝালো হলেই মনে হবে চমৎকার! এই intoxication of the regime থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে এবং তা করা যায় যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের দ্বারা কোন প্রকার হুজুগে না মেতে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায়। এবং তা করার ও গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারীদের শাসনপাত হতে থাকে। নতুন মূল্যের সাহায্যে এই যে রণকৌশল সৃষ্টি করা, এর তাৎপর্য ভালো করে খেয়াল করে দেখতে হবে। নইলে স্বদেশী কী, আত্মশক্তি কী, তার যথার্থ রাজনৈতিক মূল্য কী -সেসব বোঝা যায় না। রিচার্ড গ্রেগ-এর Power of non-violence গ্রন্থ অনুসরণ করে বলা যায় When the old values and symbols which were the source and inner strength of the ruling class are altered and demolished, the power of the ruling class as such disappear. (Gregg, Rechard B., 1960).

প্রায় একই জাতীয় প্রশ্ন লুই মামফোর্ডও তুলেছেন। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যেসব মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে, সে মূল্যবোধ দিয়ে যদি সমাজতন্ত্র গড়তে যাই তাহলে নতুন কিছু হল না, তাকে বিপ্লবী সভ্যতা বা নতুন সভ্যতা বলা যায় না। বস্তুত তা করাও সম্ভব নয়। কেন না সে কথা মেনে নিলে ধনতন্ত্রের ভিতই শক্ত হয়। অথচ আজকে যারা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে প্রচার করেন, অথবা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে চান, তাদের মধ্যে কোন নতুন

মূল্যবোধ জাগ্রত হয়নি, তারা আচারে-ব্যবহারে ধনীদের আদবকায়দাগুলি, ধনীদের মূল্যবোধগুলিই গ্রহণ করে চলেছেন। ফলে নতুন কোন মূল্যবোধ, নতুন কোন সাহিত্য, নতুন কোন শিল্প তারা গড়তে পারেননি, মুখে যতই কেননা নতুন কথা বলুন। তাই মামফোর্ড বলেছেন, "In the very act of contending against the present order, they have accepted the ends for which that order stands and have been content to demand simply that they be universalized. This perhaps account for the essential uncreativeness of the labor movement. By a revolution they do not mean a transvaluation of values: they mean a dilution and spreading out of established practices and institutions." (Mumford, Lewis, 1928, p. 253)

Material comfort-টা সকলের জন্য ব্যাপক করা, বিজ্ঞানের অবদানের ভাগ সবারই পাওয়া, এর বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে না। কথা হলো, সেগুলিকে আমরা কেমন করে ভোগ করবো, এর সবগুলিই ভোগ করার মতো কিনা; অথবা অনেকগুলি বর্জন করার মতো আছে কিনা, সেসব বিচার করার আছে কিনা, সেকথা বিচার করে ভালোমন্দ জ্ঞান সম্বন্ধে নিজেদের বিচার অনুযায়ী মানদণ্ড তৈরি করা, ধনীদের মানদণ্ড নিজেদের জন্য গ্রহণ করা নয়। যদি ধনীরা আজ আলস্যকে শ্রেয় বলে মনে করে, যে যত অলস সে ততো সম্মানিত, যে যত মদ খাবে সে ততো উঁচুদরের লোক -এমনি ধরণের একটা মানদণ্ড সৃষ্টি করে থাকে, তাই বলে কি শ্রমিক সভ্যতা, আলস্য ও মদটাকে সকলের পাওয়া চাই, এমন ধরণের আওয়াজ তুলতে পারে? ধনতান্ত্রিক সভ্যতা অনেক কলকব্জা, অনেক বিজ্ঞানের প্রসার করেছে। আর যারা বিজ্ঞানী, তাদের তো আম জনতা দেখতে পায় না, কিন্তু ধনীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, কায়দাকানুন সর্বদাই দেখতে পায়, এবং সেগুলিকেই যদি বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলে বুঝে নেয় তবে তার মতো অভিশাপ আর কিছু নেই। ধনীসমাজের সত্যিকারের বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীগুণীদের জীবন আমরা অনুকরণ করি না, করি এই ধনীদের এবং ধনীদের উচ্ছিষ্টকে আমরা মনে করি কালচার বা সংস্কৃতি। এই মোহের বিরুদ্ধে গান্ধিজি সাবধান করে গেছেন। এবং এই মোহ সৃষ্টি হলে ধনীদের দালাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যারা লড়াই করবে, যারা নতুন সমাজের জন্য বিপ্লব করবে, তাদেরকে সত্যিকার শক্তিমান করতে হলে তাদের চরিত্র নতুন মূল্যবোধ দিয়ে সৃষ্টি করতে হবে। এবং তাতেই লড়াই করা সহজ হবে। এই কথাই গান্ধি-শিষ্য বিনোবা অন্য ভাষায় বলেছেন, To turn the direction is the simplest way to outstrip others.

এই মহাত্মা সম্বন্ধে তাই আইনস্টাইন বলেছেন, যে হাজার বছর পরে মানুষ অবাক হয়ে ভাববে যে এমন ধরণের একটি লোক পৃথিবীর ধুলিতে একদিন বিচরণ করেছিল.....আশ্চর্য!

তথ্যসূত্র:

1) Gandhi, Mahatma. (28 Oct. 1939). C. P. local bodies give the lead. *Harijan*. 7 (38), 319.
2) Gandhi, Mahatma. (1950). *Gandhi's letter to a disciple. Introduction by John Haynes Homes. Preface by Mira Behn.* New York: Harper and Brother Publishers.
3) Gregg, Rechard B. (1960). *The power of nonviolence* (2nd rev. ed.). Maine: Greenleaf Books.
4) Mumford, Lewis. (1928). *The story of utopias; with an introduction by Hendrik Willem Van Loon.* New York: Boni and Liveright Inc.

5) Neheru, Jawaharlal. (1994). *Discovery of India* (Centenary ed.). Calcutta: Signet Press.
6) Newman, Cardinal. (1954). Lead, kindly light etc. *The Hymn*, 5-6, 95.
7) Pravu, R. K. (1954). *This was Bapu: One hundred and fifty anecdotes relating to Mahatma Gandhi.* Ahmedabad: Navajivan Publishing House.
8) Tandulkar, D. J. (1953). *Mahatma* (1st ed., Vol. 2). New Delhi, The Publications Division. Ministry of Information & Broadcasting. Government of India.
9) Tandulkar, D. J. (1953). *Mahatma* (1st ed., Vol. 3). New Delhi: The Publications Division. Ministry of Information & Broadcasting. Government of India.
10) Tandulkar, D. J. (1953). *Mahatma* (1st ed., Vol. 7). New Delhi: The Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.